দুর্যোগ ও দূষণ
(Disaster and Pollution)

ইউনিট ১২

ভূমিকা

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত বিষয় দুর্যোগ ও দূষণ। দুর্যোগ হলো প্রকৃতির এমন একটি অবস্থা যা খারাপ বা অকল্যাণকর পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। অন্যদিকে, দূষণ হলো পরিবেশের উপাদানগুলোর (যেমন-বায়ু, পানি, মৃত্তিকা প্রভৃতি) নেতিবাচক পরিবর্তন যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দুর্যোগ ও দূষণ দুটোই মানুষসহ অন্যান্য প্রাণি ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর। এই ইউনিটে দুর্যোগ ও দূষণ, দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্পর্ক, বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই ইউনিট পাঠের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে দুর্যোগ ও দূষণ সম্পর্কে জানতে এবং তা মোকাবেলায় ভূমিকা রাখতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১২.১ : দুর্যোগ ও দূষণ এর ধারণা
পাঠ-১২.২ : বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ
পাঠ-১২.৩ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূষণের সম্পর্ক
পাঠ-১২.৪ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
পাঠ-১২.৫ : দুর্যোগ ও দূষণ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

পাঠ-১২.১ দুর্যোগ ও দূষণ এর ধারণা (Concept of Disaster and Pollution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুর্যোগের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও ধরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- দূষণ, কারণ এবং ধরণ বর্ণনা করতে পারবেন।

দুর্যোগ ও দূষণ

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত বিষয় দুর্যোগ ও দূষণ। এই দুইটি বিষয় মানুষের স্বাভাবিক জীবন ও পরিবেশের ছন্দ পতন ঘটায়। ফলে স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশই এ সমস্যা থেকে রেহাই পেতে বহুমুখী চেষ্টা করে থাকে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই পাঠে আমরা দুর্যোগ ও দূষণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিব।

দুর্যোগ (Disaster) : দুর্যোগ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Disaster। এটি গ্রিক শব্দ Dis এবং Aster এর সমন্বয়ে গঠিত। Dis অর্থ মন্দ বা খারাপ এবং Aster অর্থ তারা। গ্রিক জ্যোতির্বিদগণ মনে করতেন, আকাশে কোনো তারা খারাপ অবস্থানে থাকলে খারাপ ঘটনা ঘটবে। সুতরাং উৎপত্তিগতভাবে দুর্যোগ বলতে এমন একটি অবস্থা বুঝায় যা মানুষকে মন্দ বা অকল্যাণকর পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। দুর্যোগ বলতে এমন একটি বিপর্যয়কে বুঝায় যা কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের বেশিরভাগ মানুষকে বিপদাপন্ন করে তোলে এবং উক্ত জনগোষ্ঠির তা মোকাবেলা করার ক্ষমতা সাধ্যের বাইরে চলে যায়। এসব দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মানুষকে অনেক মূল্য দিতে হয়। দুর্যোগ কখনো হঠাৎ সংঘটিত হয় আবার কখনোবা এক বা একাধিক ঘটনা ধীরে ধীরে দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে। আবার অনেক সময় একটি দুর্যোগ একাধিক দুর্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমন- ভূমিকম্প থেকে সুনামি হতে পারে। আবার সুনামি থেকে জলোচ্ছ্বাস এবং জলোচ্ছ্বাস থেকে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা হতে পারে।

দুর্যোগের প্রকারভেদ : পৃথিবীব্যাপী যে সকল দুর্যোগ সংঘটিত হয় সেগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ।

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Disaster): প্রাকৃতিক কারণে যে সকল দুর্যোগ সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে (চিত্র ১২.১.১)। এ ধরনের দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, তুষারপাত ইত্যাদি।

২. মানবসৃষ্ট দুর্যোগ (Man-made Disaster) : মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বলতে মানুষের অবহেলা, ভুলভ্রান্তি বা কোনো বিশেষ অভিপ্রায়ের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগকে বুঝায় (চিত্র ১২.১.২)। অর্থাৎ এ ধরনের দুর্যোগ মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ, পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ, রাসায়নিক দূষণ, খাদ্যে কীটনাশক ব্যবহার, অপরিকল্পিত ও ত্রুটিপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদি মানবসৃষ্ট দুর্যোগের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৫ সালে আমেরিকা কর্তৃক জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে অসংখ্য মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকার সাভারে রানা প্লাজা নামে একটি ভবন ধ্বসে পড়ে বহু মানুষ হতাহত হয়। এগুলো মানবসৃষ্ট দুর্যোগের উদাহরণ।

চিত্র ১২.১.১ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা)

চিত্র ১২.১.২ : মানব সৃষ্ট দুর্যোগ (ভবন ধ্বস)

দুর্যোগের ধরণ : দুর্যোগ দুই ধরনের হতে পারে। যথা– ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগ এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন দুর্যোগ।

১. ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগ (Slow Onset Disaster) : ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগ হলো এমন একটি অবস্থা, যা মানুষের খাদ্য ও জীবিকানির্বাহের পণ্যসামগ্রী সংগ্রহের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত হয়। যেমন- খরা, শস্যহানি, কৃষিক্ষেতে পোকামাকড়ের আক্রমণ ইত্যাদি। এ ধরনের দুর্যোগ সহজেই চিহ্নিত করা যায় বলে তা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়।

২. দ্রুত গতিসম্পন্ন দুর্যোগ (Rapid Disaster) : এ ধরনের দুর্যোগ আকস্মিক ঘটে থাকে বলে তা সহজে প্রতিরোধ করা যায় না। দ্রুত গতিসম্পন্ন দুর্যোগের ফলে মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং জীবন ও সম্পদহানি ঘটে। যেমন- ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি।

দূষণ (Pollution) : মানুষ যে পরিবেশে বসবাস করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে, সে পরিবেশের বিঘ্ন সৃষ্টিতে সক্ষম ক্ষতিকর যে কোনো অবস্থার নাম দূষণ (চিত্র ১২.১.৩)। অন্যভাবে বলা যায় যে, রাসায়নিক ভৌতিক ও জৈবিক কারণে পরিবেশের কোনো উপাদানের যে কোনো ধরনের নেতিবাচক পরিবর্তনই হলো দূষণ। অর্থাৎ দূষণের ফলে পরিবেশের অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন ঘটে যা মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, সভ্যতা প্রভৃতির ক্ষতিসাধন করে। আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত দেখা যায় যে, বিভিন্ন কারণে পরিবেশের দূষণ ঘটছে যা জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। আর যেসব উপাদান দূষণ সৃষ্টি করে সেসব উপাদানকে দূষক (Pollutant) বলা হয়।

চিত্র ১২.১.৩ : পরিবেশ দূষণ

দূষণের কারণ : দূষণ সৃষ্টির কারণসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- মানবসৃষ্ট কারণ এবং প্রাকৃতিক কারণ।

১. মানবসৃষ্ট কারণ (Man-made Causes) : মানুষের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের যে দূষণ ঘটে সেগুলোকে মানবসৃষ্ট কারণ বলে। যেমন- শিল্প-কারখানার ধোঁয়া, তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিস্ফোরণ, ক্ষতিকর গৃহস্থালি বর্জ্য, কৃষিতে কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি।

২. প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes) : অনেক সময় প্রাকৃতিক কারণেও পরিবেশ দূষণ ঘটে। যেমন- অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নিঃসৃত সালফার-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস পরিবেশের উপাদানগুলোর দূষণ ঘটায়।

দূষণের প্রকারভেদ : দূষণের ফলে পরিবেশের যে উপাদানগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেগুলো হলো বায়ু, পানি, মৃত্তিকা, শব্দ ইত্যাদি। এসব দূষণের ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনের ব্যত্যয় ঘটে এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ-জীবাণুতে আক্রান্ত হয়। নিম্নে বর্ণিত ক থেকে ঘ পর্যন্ত দূষণগুলি পৃথিবীর উপরিভাগে হয়ে থাকে এবং ঙ নং দূষণটি ভূ-গর্ভে দেখা যায়।

ক. বায়ু দূষণ (Air Pollution) : প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম বায়ু দূষণ। জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বায়ু বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যখন দূষিত গ্যাস, ধোঁয়া, ভস্ম ইত্যাদি ক্ষতিকর উপাদানের সমাবেশ ঘটে এবং এর প্রভাব হিসেবে মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদজগতের ক্ষতি করে, তখন তাকে বায়ু দূষণ বলে। বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ হলো কল-কারখানা ও যানবাহনের নির্গত কালো ধোঁয়া, গৃহস্থালি জ্বালানি, ময়লা-আবর্জনা, অপরিকল্পিত পয়ঃপ্রণালি ইত্যাদি।

খ. পানি দূষণ (Water Pollution) : পানির সঙ্গে যখন কোনো অবাঞ্চিত পদার্থ মিশে যায়, তখন পানির ভৌত রাসায়নিক ও জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণি, মানুষসহ জীবজগতের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তখন তাকে পানি দূষণ বলে। পানি দূষণের অন্যতম কারণ হলো- কল-কারখানার বর্জ্য, গৃহস্থালি বর্জ্য, জলাধারের সাথে নর্দমার সংযোগ, কৃষিজাত দূষক, কীটনাশক, ক্ষতিকারক খনিজ পদার্থ, তেলবাহী জাহাজ দুর্ঘটনা, মৃত জীবজন্তু, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, চিকিৎসা বর্জ্য ইত্যাদি।

গ. মৃত্তিকা দূষণ (Soil Pollution) : মৃত্তিকা দূষণ বলতে শিল্প বর্জ্য, কৃষি বর্জ্য, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, জমাকৃত আবর্জনা এবং বিভিন্ন উপাদান মৃত্তিকার যে ক্ষতিসাধন করে তাকে বুঝায়। মৃত্তিকা দূষণের অন্যতম কারণ হলো-মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার, মাটি পোড়ানো, শিল্প বর্জ্য, মৃত্তিকার লবণাক্ততা, বন উজাড় প্রভৃতি। এছাড়া মৃত্তিকায় অপচনশীল পদার্থ যেমন পলিথিনের আধিক্য দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে।

ঘ. শব্দ দূষণ (Sound Pollution) : মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতার উর্ধ্বে সৃষ্ট যে কোনো শব্দ যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ব্যাঘাত ঘটায় তাই হলো শব্দ দূষণ। শব্দ দূষণের কারণ হলো বাস, ট্রাক, ট্রেন ও লঞ্চের হর্ণ, রেডিও, ক্যাসেট, টেলিভিশন ও মাইক উচ্চ শব্দে বাজানো। এছাড়া সাইরেন ও যুদ্ধসামগ্রীর শব্দ, বোমার বিস্ফোরণ, মেঘের গর্জন প্রভৃতি শব্দ দূষণের উৎস।

ঙ. আর্সেনিক দূষণ (Arsenic Pollution) : আর্সেনিক দূষণ ভূ-পৃষ্ঠের নিচে অবস্থিত পানির স্তরে হয়ে থাকে। এ দূষণের ফলে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, দুর্যোগ ও দূষণ উভয়ই মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন বিঘ্ন করে এবং সম্পদ ও জীবনহানি ঘটায়। এছাড়া বিভিন্ন রোগ-জীবাণু ছড়ানোসহ পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে। সুতরাং দুর্যোগ ও দূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে তা মোকাবেলায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	দুর্যোগ ও দূষণের পার্থক্য নির্ণয় করুন।

সারসংক্ষেপ

দুর্যোগ হলো এমন একটি অস্বাভাবিক অবস্থা যা মানুষের জীবন, সমাজ ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মানুষকে অনেক কষ্ট করতে হয় এবং স্বাভাবিক জীবনের ব্যাঘাত ঘটে। দুর্যোগ প্রধানত দুই ধরনের হতে পারে। যথা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতি সৃষ্ট আর মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মনুষ্য সৃষ্ট। মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে পারে। আর মানবসৃষ্ট দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে দূষণ হলো প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর নেতিবাচক পরিবর্তন। যেমন- পানি দূষণ, বায়ু দূষণ। মানুষের বহুমুখী কর্মকাণ্ডই মূলত দূষণের জন্য দায়ী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভূমিকম্পের ফলে কোন দুর্যোগটি হতে পারে?
(ক) মৃত্তিকা ক্ষয় (খ) বন্যা (গ) সুনামি (ঘ) খরা

২। প্রাকৃতিক দুর্যোগের উদাহরণ হলো–
i. বন্যা ii. খরা iii. অগ্ন্যুৎপাত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। মানবসৃষ্ট দূষণের কারণ কোনটি?
(ক) কীটনাশক ব্যবহার (খ) যানবাহনের ধোঁয়া
(গ) তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিস্ফোরণ (ঘ) সবগুলো সঠিক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সাদিকুল সাহেব একজন সফল কৃষক। তাঁর জমিতে অধিক ফসল উৎপাদিত হয় যা অন্যদের উৎসাহিত করে। কিন্তু কিছুদিন ধরে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ কমতে শুরু করায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ছুটে গেলেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর কাছে। এরপর মাটি পরীক্ষা করে জানতে পারলেন এক ধরনের দূষণের কথা।

৪। উদ্দীপকে উল্লিখিত দূষণটির নাম কী?
(ক) বায়ু দূষণ (খ) পানি দূষণ (গ) মৃত্তিকা দূষণ (ঘ) শব্দ দূষণ

৫। আলোচ্য দূষণের ফলে ক্ষতি হয়–
i. মানুষের ii. কীটপতঙ্গের iii. ফসলের
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.২ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ (Major Natural Disaster in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ সম্পর্কে জানবেন এবং
- সৃষ্ট দুর্যোগসমূহের কারণ এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ

পৃথিবীর প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভৃতি কারণে প্রায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন। ক্ষয়ক্ষতি হয় সম্পদ ও জীবনের। বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী ঝড় ও টর্নেডো, বন্যা, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, খরা, আর্সেনিক, ভূমিকম্প ও সুনামি প্রভৃতি। নিম্নে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো:

১. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস (Cyclone and Tidal Surge) : ঘূর্ণিঝড়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ Cyclone। এটি গ্রিক শব্দ Kyklos থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ কুণ্ডলি পাকানো সাপ। ঘূর্ণিঝড়ের বাতাস কুণ্ডলি পাকানো সাপের আকার ধারণ করে বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানী হেনরি পিডিংটন ১৮৪৮ সালে প্রথম এ শব্দটি ব্যবহার করেন। সাধারণত এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়ে থাকে।

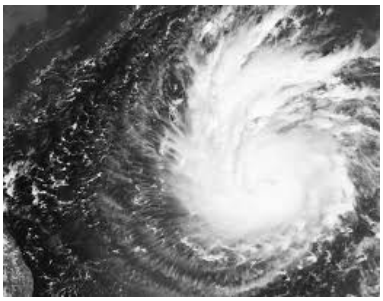

চিত্র ১২.২.১ : ঘূর্ণিঝড়ের চোখ

বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির একটি আদর্শ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়সমূহের মধ্যে কোনো কোনোটি মারাত্মক ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য সমুদ্র পৃষ্ঠে সাধারণত ২৭° সেলসিয়াস বা এর বেশি তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থলে নিম্নচাপ এবং চারপাশে উচ্চচাপ বিরাজ করে। এসময় উচ্চচাপযুক্ত বায়ু প্রবলবেগে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রভাগে যেখানে নিম্নচাপ থাকে সেদিকে ধাবিত হয়। এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। এটি উষ্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠে উৎপত্তি লাভ করে মহাদেশীয় মূলভাগের দিকে অগ্রসর হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থলকে চোখ বলে (চিত্র ১২.২.১)। এটি দেখতে অনেকটা মানুষের চোখের মতো। বিগত অর্ধশতাব্দীতে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানে। এর মধ্যে ১৯৭০, ১৯৮৮, ১৯৯১, ২০০৭, ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় অন্যতম। জীবনহানির দিকে থেকে সবচেয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ১৯৭০ এবং ১৯৯১ সালে সংঘটিত হয়। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৫ লক্ষাধিক, ১৯৯১ সালে ১.৪০ লক্ষ, ২০০৭ সালে ১০ হাজার এবং ২০০৯ সালে ৭ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে। ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলীয় জেলাসমূহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এসব জেলার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা প্রভৃতি।

ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত জলোচ্ছ্বাস। ঘূর্ণিঝড় উৎপত্তির পর যখন প্রবলবেগে স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হয় তখন সমুদ্রের জলরাশি ফুলে ওঠে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মূল ভূ-খণ্ডে আঘাত হানে। এরূপ উঁচু জলরাশিকে জলোচ্ছ্বাস বলে। এসময় জলরাশির উচ্চতা ১৫-৪০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার সময় যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা থাকে তাহলে পানি আরো বেশি ফুলে ওঠে এবং ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ভোলায় প্রায় ৪০ ফুট, ২০০৭ সালে পটুয়াখালী ও বরগুনা অঞ্চলে প্রায় ২০-২৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল। ঘূর্ণিঝড় ছাড়াও ভূমিকম্পের ফলেও জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসকে সুনামি বলে। জলোচ্ছ্বাসের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মানুষসহ জীবজন্তু ও সহায় সম্পদ পানিতে ভেসে চলে যায় এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমুদ্রের সাথে মিশে যায়। যেমন-১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে পরবর্তীতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় বহুমুখী পদক্ষেপ ২০০৭ এবং ২০০৯ সালে যথাক্রমে সিডর ও আইলায় জীবনহানির পরিমাণ সহনীয় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. কালবৈশাখী ঝড় ও টর্নেডো (Nor' wester & Tornado) : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে কালবৈশাখী ঝড় এবং টর্নেডো অন্যতম। কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন জলবায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণত বৈশাখ মাসের শেষের দিকে এ ঝড় হতে দেখা যাওয়ায় একে কালবৈশাখী ঝড় বলে। মার্চ-এপ্রিল মাসে সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ঢেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়। এ ঝড়ই কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত। এ সময় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সংঘটিত হয়। অনেক সময় বৃষ্টিপাতের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে। দেশের পূর্বাঞ্চলে এ ঝড় অধিক হয়ে থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ে মানুষ, পশুপাখি ও সম্পদহানি ঘটে, কাঁচা ঘরবাড়ি ধ্বংস হয় এবং ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়।

অন্যদিকে, টর্নেডোও একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। টর্নেডো শব্দটি স্পেনিশ Tornada থেকে এসেছে, যার অর্থ বজ্রঝড় বা Thunder Storm। ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় টর্নেডোর ক্ষেত্রেও প্রচণ্ডবেগে বাতাস ঘুরতে ঘুরতে প্রবাহিত হয়। কোনো স্থানে নিম্নচাপ বা লঘুচাপ সৃষ্টি হলে উক্ত স্থানের উষ্ণ বাতাস উপরে উঠে যায় এবং ঐ শূন্য জায়গা পূরণের জন্য চতুর্দিকের শীতল বায়ু দ্রুতগতিতে ধাবিত হয় এবং টর্নেডোর উৎপত্তি হয় (চিত্র ১২.২.২)। সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে টর্নেডো আঘাত হানে। ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় প্রলয়ংকরী টর্নেডো আঘাত হানে এবং ব্যাপক ধ্বংসলীলা সাধিত হয়। টর্নেডোর ক্ষেত্রে বাতাসের গতিবেগ সাধারণত ঘণ্টায় ৪৮০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার হতে পারে। টর্নেডোর বিস্তার মাত্র কয়েক মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর টর্নেডো হতে দেখা যায়। টর্নেডো এবং ঘূর্ণিঝড়ের মূল পার্থক্য হলো ঘূর্ণিঝড় উৎপত্তি হয় সমুদ্রে আর টর্নেডো যে কোনো স্থানে সৃষ্টি হতে পারে।

চিত্র ১২.২.২ : টর্নেডো

বন্যা (Flood) : সাধারণ অর্থে নদীর পানি যখন দু'কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম, নগর, বন্দর, বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফসল বিনষ্ট করে তখন তাকে বন্যা বলে। অধ্যাপক Chambers এর মতে, 'Flood is a condition of abnormally great flow of water in the river'. প্রায় প্রতি বছর দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয়।

বন্যার প্রকারভেদ : সাধারণত বন্যা চার প্রকারের হয়ে থাকে। যথা-মৌসুমী বন্যা, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় বন্যা এবং নগর বন্যা।

১. মৌসুমী বন্যা (Seasonal Flood) : বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে যে বন্যার সৃষ্টি হয়, তাকে মৌসুমী বন্যা বলে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে মৌসুমী বন্যা তেমন ক্ষতি করে না বরং ফসল উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। তবে মাঝে মাঝে বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে।

২. আকস্মিক বন্যা (Flash Flood) : বর্ষা মৌসুম ব্যতীত অন্য যে কোনো মৌসুমী আকস্মিক বৃষ্টিপাত বা পাহাড়ি ঢলের ফলে যে বন্যার সৃষ্টি হয়, তাকে আকস্মিক বন্যা বলে। বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় আকস্মিক বন্যা হতে দেখা দেয়। বোরো মৌসুমে এ ধরনের বন্যা হলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

৩. উপকূলীয় বন্যা (Coastal Flood) : উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, সুনামি বা জোয়ার-ভাটাজনিত কারণে যে বন্যা সৃষ্টি হয়, তাকে উপকূলীয় বন্যা বলে।

৪. নগর বন্যা (Urban Flood) : নগর এলাকায় সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা দেখা দেয়। এ ধরনের বন্যাকে নগর বন্যা বলে। ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বেশ কয়েকটি বড় শহরে এ ধরনের বন্যা দেখা দেয়।

বন্যার কারণ : প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট উভয় প্রকার কারণেই বন্যা সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হলো:

সারণি ১২.২.১ : বন্যার প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণ

প্রাকৃতিক কারণ	মানবসৃষ্ট কারণ
বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টি	নদীর গতিপথে বাধা প্রদান
ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমিরূপের গঠন ও প্রকৃতি	খাল ও নালা ভরাট করে ফেলা
পাহাড়ি বরফগলা পানি	অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ
নদীর আকাঁবাঁকা গতিপথ	নদীর তলদেশ ভরাট করে ফেলা
নিম্নচাপের ফলে ভারী বর্ষণ	বনজ সম্পদ ধ্বংস করা
বর্ষা মৌসুমে নদীর অতিরিক্ত পানি	প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে অপরিকল্পিতভাবে নদীশাসন করা
নদীর পানি প্রবাহ ক্ষমতা কমে যাওয়া	উজানে পানি প্রত্যাহার বা বাঁধ নির্মাণ
বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন প্রভৃতি।	পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা প্রভৃতি।

বন্যার প্রভাব : বন্যার ফলে বহুমুখী ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় (চিত্র ১২.২.৩)। যেমন-জীবন ও সম্পদহানি, ফসল উৎপাদন হ্রাস, উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষিজমি লবণাক্ত হওয়া, রোগ-ব্যাধির বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়া, সুপেয় পানি সংকট, খাদ্য ও পুষ্টির অভাব প্রভৃতি। বিগত অর্ধশতাব্দীতে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ বন্যা সংঘটিত হয়। এর মধ্যে ১৯৫৪, ১৯৬৩, ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭ সালের বন্যা অন্যতম। ১৯৯৮ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং দেশের অধিকাংশ জেলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

নদীভাঙন (Riverbank Erosion) : সাধারণভাবে নদীর পানি প্রবাহের ফলে নদীর তীর বা পাড়ের ভাঙনকে নদীভাঙন বলে। বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত দৃশ্য নদীভাঙন (চিত্র ১২.২.৪)। এ সময় নদীতে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হওয়ার ফলে নদীভাঙন দেখা দেয়। সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তাসহ অসংখ্য শাখানদী ও উপনদী দ্বারা দেশের প্রায় ১০০টি উপজেলা কমবেশি ভাঙনের শিকার হয়। নদীভাঙনপ্রবণ জেলাসমূহের মধ্যে জামালপুর, কুড়িগ্রাম, মুন্সিগঞ্জ, বগুড়া, মাদারীপুর, নারায়নগঞ্জ, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, শরীয়তপুর, শেরপুর, রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, বরিশাল, গোপালগঞ্জ এবং উপকূলীয় অঞ্চল অন্যতম।

চিত্র ১২.২.৩ : বন্যার ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগ

নদীভাঙনের কারণ : নদীভাঙন সৃষ্টির জন্য প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট কারণও দায়ী। নদীভাঙনের প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট কারণসমূহ সারণি ১২.২.২ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি ১২.২.২ : নদীভাঙনের প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট কারণ

প্রাকৃতিক কারণ	মানবসৃষ্ট কারণ
বর্ষা মৌসুমে অত্যধিক বৃষ্টিপাত	নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন করা
নদীর গতিপথ অধিক আঁকাবাঁকা হওয়া	নদী তীরের গাছপালা নিধন করা
পলি জমা হয়ে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া	নদী তীর এবং তলদেশ থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন
বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া	নদী তীর দখল করে নদীর গতিপথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা
নদীগর্ভে নরম ও ক্ষয়িষ্ণু শিলার উপস্থিতি	নিয়মিত নদী খনন না করা
নদীগর্ভে ফাটলের উপস্থিতি	নদীতে বা নদী তীরে অবৈধভাবে বাঁধ দিয়ে চাষাবাদ করা
পার্বত্য এলাকায় বরফ গলনের মাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি।	অপরিকল্পিত ও অধিক পরিমাণে নৌযান চালানো ইত্যাদি।

নদীভাঙনের প্রভাব : নদীভাঙনের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অসংখ্য লোক ঘরবাড়ি হারিয়ে বাস্তুহারা এবং ভূমিহীন হয়ে পড়ে। নদীভাঙনের অন্যান্য প্রভাবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-উদ্বাস্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্রতা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, পুষ্টিহীনতা, শহরে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি, রোগ-ব্যাধির বিস্তার ইত্যাদি। এছাড়া নদীভাঙনের ফলে সামাজিক বন্ধনে ভাঙন দেখা যায়। কারণ নদী তীরবর্তী লোকজন জমিজমা ও সহায় সম্পদ হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে শহরে গমন করে এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কে টান পড়ে।

লবণাক্ততা (Salinity) : লবণাক্ততা বলতে মাটি ও পানিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বুঝায়। সাধারণত লবণাক্ততার মাত্রা পরিমাপ করা হয় Parts Per Thousand বা পিপিটি (PPT) দ্বারা। সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততার গড় মাত্রা ৩৫পিপিটি অর্থাৎ ১ কিলোগ্রাম পানিতে প্রায় ৩৫ গ্রাম লবণ থাকে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। বঙ্গোপসাগরের পানি জোয়ারের সময় নদীর মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিতে প্রবেশ করে লবণাক্ততা সৃষ্টি করে। সাধারণত আগস্ট মাস থেকে লবণাক্ততা শুরু হয় এবং ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। উপকূলীয় ১৬টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় লবণাক্ততা দেখা যায়। এর মধ্যে সর্বাধিক লবণাক্ততায় আক্রান্ত খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা জেলা। এছাড়া বরিশাল, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, কক্সবাজার, ফেনী প্রভৃতি জেলা লবণাক্ততায় আক্রান্ত।

লবণাক্ততার কারণ : সাধারণত উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি ও পানিতে লবণাক্ততার জন্য জোয়ার-ভাটা ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিকে দায়ী করা হয়। আর সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের বহুমুখী কর্মকাণ্ডকেই দায়ী করা হয়।

লবণাক্ততার প্রভাব : লবণাক্ততার ফলে যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো-

১. উপকূলীয় অঞ্চলের জমি কৃষিকাজের অনুপযোগী হয়ে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া;
২. সুপেয় পানির অভাব দেখা দেওয়া;
৩. উদ্বাস্তু লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি;
৪. সম্পদহানি ও দারিদ্রতা বৃদ্ধি;
৫. বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া;
৬. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি;
৭. মিঠা পানির মাছের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস;
৮. গাছপালায় মড়ক লাগা ও ফসলের গোড়া পচে যাওয়া;
৯. সামাজিক বন্ধনে শিথিল হওয়া প্রভৃতি।

খরা (Drought) : সাধারণত খরা বলতে কোনো এলাকায় দীর্ঘসময় ধরে ভূমিতে পানির অনুপস্থিতিকে বুঝায়। অর্থাৎ কোনো এলাকা বৃষ্টিহীন অবস্থায় থাকলে বা অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হলে মাটির স্বাভাবিক আর্দ্রতা কমে গিয়ে শুষ্ক হয়ে পড়ে। এর ফলে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায় (চিত্র ১২.২.৫) এবং পানির স্তর নিচে নেমে যায়। এরূপ অবস্থাকে খরা বলে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে খরার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। বিগত অর্ধ শতকের ১৯৭৩, ১৯৭৫, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৯, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৫ এবং ২০১৬ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অধিক মাত্রায় খরা দেখা দেয়। বাংলাদেশের খরার মাত্রা ও খরাপ্রবণ অঞ্চলসমূহ সারণি ১২.২.৩ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি ১২.২.৩ : খরার মাত্রা ও খরাপ্রবণ অঞ্চলসমূহ

খরার মাত্রা	খরাপ্রবণ অঞ্চল
অতি তীব্র	রাজশাহী ও চাপাইনবাবগঞ্জ
তীব্র	দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর জেলা এবং টাঙ্গাইল জেলার অংশবিশেষ
মাঝারি	রংপুর ও বরিশাল জেলা এবং দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার অংশবিশেষ
সামান্য	তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার পললভূমি এলাকা

খরার কারণ : খরা মূলত প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি মানুষের বহুমুখী কর্মকাণ্ড খরা সৃষ্টিতে সহায়ক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। নিম্নে খরার প্রধান কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. সময়মতো বৃষ্টিপাতের অভাব;
২. পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা;
৩. অপরিকল্পিতভাবে বনভূমি উজাড়;
৪. নদীর উজানে অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ;
৫. এল নিনো ও লা নিনোর প্রভাব প্রভৃতি।

খরার প্রভাব : খরার ফলে যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো -

১. কৃষি ফসলের উৎপাদন হ্রাস;
২. ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া;
৩. ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র অভিগমন;
৪. উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্ন হওয়া;
৫. খাদ্য ও পুষ্টির সংকট তৈরি হওয়া;
৬. গ্রামীন দারিদ্র ও বেকারত্ব বৃদ্ধি;
৭. মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস প্রভৃতি।

আর্সেনিক (Arsenic) : আর্সেনিক একটি বিষাক্ত মৌলিক পদার্থ। এটি এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা ভূ-গর্ভস্থ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বাংলাদেশে আর্সেনিক নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু হয় ১৯৮৪ সালে। এক জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের ৪১টি জেলার নলকূপের পানিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অধিক আর্সেনিক রয়েছে (গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.০১ পিপিএম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। আর্সেনিক আক্রান্ত জেলাসমূহের মধ্যে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, যশোর, মাগুরা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, রাজশাহী, পাবনা অন্যতম।

আর্সেনিকের প্রভাব : আর্সেনিক দূষণযুক্ত পানি ব্যবহার করলে মানবদেহে বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় (চিত্র ১২.২.৬)। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়া;
২. জিহ্বা, হাত ও পায়ের তালুতে কালো দাগ;
৩. বমি, অরুচি, রক্ত আমাশয়, মুখে ঘা;
৪. ফুসফুস, জরায়ু, মূত্রনালী, মূত্রথলী ও বৃক্কে ক্ষত তৈরি;
৫. রক্তশূন্যতা, শ্বসন যন্ত্র আক্রান্ত হওয়া;
৬. প্রজনন স্বাস্থ্যে প্রভাব;
৭. স্মৃতি শক্তি হ্রাস;
৮. শরীরে অস্বাভাবিক পরিবর্তন প্রভৃতি।

চিত্র ১২.২.৪ : নদীভাঙনের দৃশ্য

চিত্র ১২.২.৫ : খরায় মৃত্তিকার চৌচির অবস্থা

চিত্র ১২.২.৬ : আর্সেনিকের প্রভাব

ভূমিকম্প (Earthquake) : বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে ভূমিকম্প সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-গাঠনিক কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এদেশ। বাংলাদেশে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভূমিকম্প সারণি ১২.২.৪ এ দেখানো হলো। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশকে তিনটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো- রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৭ হলে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ, মাত্রা ৬ হলে মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ এবং মাত্রা ৫ হলে কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে গণ্য হবে। দেশের কোন অঞ্চল কোন মাত্রার ভূমিকম্প ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত তা নিম্নে দেখানো হলো:

১. মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল- দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত।
২. মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল- দেশের মধ্যাঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত।
৩. কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল- দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত।

সারণি ১২.২.৪ : বাংলাদেশে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভূমিকম্প (তারিখ, মাত্রা এবং অবস্থান)

তারিখ	রিখটার স্কেলে মাত্রা	অবস্থান
১২ জুন, ১৮৯৭	৮.৭	ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা ও রাজশাহী অঞ্চল
২২ নভেম্বর, ১৯৯৭	৬.০	চট্টগ্রাম অঞ্চল
১৮ জুলাই, ১৯১৮	৭.৬	শ্রীমঙ্গল
১৫ জানুয়ারি, ১৯৩৪	৮.৩	রংপুর অঞ্চল
১৪ জুলাই, ১৮৮৫	৭.০	মানিকগঞ্জ অঞ্চল

ভূমিকম্পের কারণ : ভূমিকম্পের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১. ভূ-ত্বক সাতটি বৃহৎ এবং কতকগুলো ছোট প্লেট দ্বারা গঠিত। এই প্লেটসমূহ একে অপরের দিকে, একে অপরের বিপরীতে অথবা পরস্পর সমান্তরালভাবে সঞ্চালিত হয়। এইরূপ সঞ্চালনের ফলে সৃষ্ট চাপ থেকে আকস্মিকভাবে প্রচণ্ড কম্পন সৃষ্টি হয়। ভূ-পৃষ্ঠে এই কম্পন ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।
২. কোনো কারণে ভূ-অভ্যন্তরে বড় রকমের শিলাচ্যুতি ঘটলে ভূমিকম্প হয়।
৩. ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবল ফ্রিকশান হয়ে কোনো অংশ ধসে পড়ে ভূ-ত্বক কেঁপে ওঠে এবং ভূমিকম্প হয়।
৪. উত্তপ্ত ভূ-অভ্যন্তর তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে শিলাস্তরে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্থান পরিবর্তন করলে ভূ-ত্বক কেঁপে উঠলে ভূমিকম্প হতে পারে।
৫. ভূ-গর্ভে সঞ্চিত বাষ্পচাপ অধিক হলে নিম্নভাগে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়, এতে ভূমিকম্প দেখা দিতে পারে।

৬. ভূ-গর্ভে চাপ হ্রাস পেলে এর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত কঠিন পদার্থ গলে নিচের দিকে অপসারিত ও আলোড়িত হতে থাকে, এতে ভূ-ত্বক কেঁপে ওঠে।
৭. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় বহির্মুখী বাষ্পরাশির চাপে ভূমিকম্প হয়।
৮. পার্বত্য অঞ্চলে বড় ধরনের শিলাচ্যুতি বা হিমবাহ অঞ্চলে হিমানী সম্প্রপাত হলে ভূমিকম্প হয়।
৯. খনি অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠের নিচের কোনো অংশ হঠাৎ ধ্বসে পড়লে ভূমিকম্প হতে পারে।
১০. ভূ-গর্ভস্থ আগ্নেয় পদার্থের উর্ধ্বমুখী চাপের ফলে ভূ-কম্পন হয়।

ভূমিকম্পের প্রভাব : ভূ-ত্বকের আকস্মিক পরিবর্তনকারী প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি ভূমিকম্প। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠে এবং ভূ-অভ্যন্তরে পরিবর্তন দেখা দেয়। নিম্নে ভূমিকম্পের মুখ্য প্রভাবসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. ভূমিকম্পের মাত্রা অধিক হলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে থাকে;
২. জীবজন্তু ও গাছপালা ধ্বংস হওয়া;
৩. ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, কল-কারখানা ধ্বংসসহ জনজীবনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া;
৪. ভূমিকম্পের ফলে ভূ-ত্বকে ফাঁটল, ভাঁজ ও চ্যুতির সৃষ্টি হতে পারে;
৫. নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হতে পারে (যেমন-১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়) ;
৬. সমুদ্রতলের পরিবর্তন এবং ভূমির উত্থান ও পতন হতে পারে;
৭. হিমানী সম্প্রপাত হতে পারে;
৮. বহু মানুষ শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হতে পারে যা ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে যা মোকাবেলা করে এদেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ সংঘটিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ বিশ্বের দুর্যোগপ্রবণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। একথা বলা যায় যে, এদেশের মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে বসবাস করে। এখানকার জনগণ প্রায় প্রতি বছর এক বা একাধিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী ঝড় ও টর্নেডো, বন্যা, খরা, নদীভাঙন, আর্সেনিক দূষণ প্রভৃতি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসব দুর্যোগ দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সম্পদহানির পাশাপাশি স্বাভাবিক পরিবেশকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন?
(ক) ২০° সে. এর অধিক (খ) ৩০° সে. এর অধিক (গ) ২৪° সে. এর অধিক (ঘ) ২৭° সে. এর অধিক

২। বাংলাদেশে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়-
i. ১৯৮০ সালে ii. ১৯৯১ সালে iii. ২০০৭ সালে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

দেশের হাওড় অঞ্চলে কখনো কখনো হঠাৎ উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে চারদিকে তলিয়ে যায়। বিনষ্ট হয় বিস্তৃত অঞ্চলের ফসল। যা এ অঞ্চলের মানুষের জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

৩। উদ্দীপকে আলোচ্য ঘটনা কী নির্দেশ করছে?
(ক) মৌসুমী বন্যা (খ) নগর বন্যা (গ) আকস্মিক বন্যা (ঘ) উপকূলীয় বন্যা

৪। কোন জেলায় আলোচ্য বন্যা দেখা দেয়?
i. সুনামগঞ্জ ii. কিশোরগঞ্জ iii. হবিগঞ্জ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূষণের সম্পর্ক (Relationship Between Natural Disaster and Pollution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূষণের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূষণের সম্পর্ক

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূষণ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ একটির ফল অন্যটি সংঘটনের মাত্রা ত্বরান্বিত করতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্ট ঘটনা যা মানব সমাজের ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি করে, সম্পদ ধ্বংস করে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে। অপরদিকে, দূষণ হলো পরিবেশের অনাকাঙ্খিত ঘটনা যা মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থার ব্যত্যয় ঘটায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূষণের সংজ্ঞা দুইটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উভয়টি মানুষের ক্ষতি করে, সম্পদ ও জীবনহানি ঘটায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিসাধন করে। অপরদিকে দূষণ ধীর গতিতে ক্ষতিসাধন করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূষণের সম্পর্ককে দুইভাগে ভাগ করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যথা–

ক. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দূষণ সৃষ্টি এবং
খ. দূষণের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি।

ক. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দূষণ সৃষ্টি : প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে জীবন ও সম্পদহানির পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ ঘটায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী দূষণ দ্বারা মানুষ দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয় সেগুলোকে তিনটি বিশেষায়িত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা–

১. বায়ুমণ্ডলীয় প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ;
২. ভূ-পৃষ্ঠের প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ এবং
৩. ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ।

১. বায়ুমণ্ডলীয় প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ : বায়ুমণ্ডলের নিজস্ব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যেসব দুর্যোগ সৃষ্টি হয় সেগুলো এ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগসমূহের মধ্যে অন্যতম ঘূর্ণিঝড়, কালবেশাখী ঝড়, টর্নেডো প্রভৃতি। এসব দুর্যোগের সময় বায়ু প্রবলবেগে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ধাবিত হয়। এসময় গমন পথের ধূলিকণা, বালুকণা, বিষাক্ত পদার্থ ও বিভিন্ন ধরনের গ্যাস মিশে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় পতিত হয়। এতে দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় দূষণ দেখা দেয়। বায়ুমণ্ডলের অতিরিক্ত গ্যাসীয় উপাদান যেমন-নাইট্রোজেন, হাইড্রোকার্বন, ওজোন গ্যাস ইত্যাদি বায়ুর গুণগতমানকে প্রভাবিত করে। এতে বিশুদ্ধ বায়ুর ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এছাড়া এসব ঝড় প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করলে বহু মানুষ, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী, পশুপাখি ইত্যাদি মারা যায়। মানুষসহ অন্যান্য মৃতদেহ দ্রুত সরাতে না পারলে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ও মৃত্তিকা দূষণ দেখা দেয় এবং রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যায় যে, বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগের ফলে যেসব দুর্যোগ সৃষ্টি হয় সেগুলো দূষণ ঘটানোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে এবং মানুষ ও প্রকৃতির ক্ষতিসাধন করে।

২. ভূ-পৃষ্ঠের প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ : প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট কারণে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন সংক্রান্ত যেসব দুর্যোগ দেখা দেয় সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। এ প্রক্রিয়ায় যেসব দুর্যোগ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বন্যা, নদীভাঙন, ভূমিক্ষয়, ভূমিধ্বস, উপকূলীয় এলাকায় ভাঙন প্রভৃতি। এসব দুর্যোগকালীন বা দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দূষণ দেখা দিতে পারে। যেমন- বন্যার ফলে বিভিন্ন এলাকার ময়লা-আবর্জনা বাহিত হয়ে পানি দূষিত করে। এর ফলে বিশুদ্ধ পানির চরম সংকট দেখা দেয় এবং বিভিন্ন রোগ- জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া বন্যার ফলে জীবজন্তু, পশুপাখি, গবাদিপশু মরে গেলে সেগুলো পঁচে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং বায়ু দূষণ ঘটায়। আবার ভূমিক্ষয় বা ভূমিধ্বস হলে মৃত্তিকা দূষিত হয়। উপকূলীয় এলাকায় ভাঙনের ফলে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে। সুতরাং বলা যায় যে, ভূ-পৃষ্ঠের প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ বিভিন্ন ধরনের দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩. ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ : ভূ-অভ্যন্তর উত্তপ্ত বলে প্রচণ্ড তাপ ও চাপের যে তারতম্য হয়, তাতে ভূ-অভ্যন্তরে প্রচন্ড শক্তির সৃষ্টি হয় এবং ভূ-ত্বকের আকস্মিক ও ধীর পরিবর্তন হয়। ভূ-অভ্যন্তরের আকস্মিক পরিবর্তনের

ফলে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি হয়ে থাকে। এসব দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ায় দূষণের উদ্ভব হতে পারে। যেমন- আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে গ্রাম, শহর ও জনপদ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ইতালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পম্পেই নগর লাভার নিচে চাপা পড়ে। এছাড়া ছাই, ভস্ম ইত্যাদি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে বাতাস দূষিত করে তোলে। আবার ভূমিকম্পের ফলে বহু মানুষ, জীবজন্তু মারা যায় এবং ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়। মৃতদেহসমূহ দ্রুত সরাতে না পারলে তা পচে দুর্গন্ধ এবং রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বায়ু, পানি এবং মৃত্তিকা দূষণ দেখা দেয়। সুতরাং বলা যায় যে, ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ দূষণের কারণ হিসেবে কাজ করে।

খ. দূষণের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি : প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে যেমন দূষণ ঘটতে পারে, ঠিক তেমনি দূষণের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নগরায়ন এবং শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ার ফলে দূষণের মাত্রাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দূষণের পিছনে মূলত মানুষের বহুমুখী কর্মকাণ্ডই দায়ী। দূষণ দীর্ঘস্থায়ী হলে তার প্রভাব পরে প্রকৃতির উপাদানগুলোর উপর। যার ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের সম্ভাবনা তৈরি হয়। যেমন- যানবাহন ও শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত বিভিন্ন গ্যাস ও ধাতব কণার মধ্যে কার্বন-মনোঅক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই- অক্সাইড প্রভৃতি বাতাসের সঙ্গে মিশে বাতাসকে দূষিত করে। গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহ যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, মিথেন, ওজোন প্রভৃতিকে বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী করা হয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হয়। এতে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, এসিড বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা ইত্যাদি সংঘটনের হার বৃদ্ধি পায়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূষণ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। একটির প্রতিক্রিয়া হিসেবে অন্যটি দেখা দিতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে সার্থক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যেমন দূষণ কমানো যেতে পারে, ঠিক তেমনি দূষণ প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাসে ভূমিকা রাখা যায়। এ লক্ষ্যে দেশীয় উদ্যোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কী ধরনের দূষণ ঘটে থাকে তার বর্ণনা দিন।

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূষণ দুইটি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হলেও উভয়টি মানুষ ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাৎক্ষণিক ক্ষতি হয়, অন্যদিকে দূষণে ধীর গতিতে ক্ষতি হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ প্রভৃতি দেখা দেয়। আবার দূষণ ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বলা যায় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূষণ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। একটির প্রভাব অন্যটিতে পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে কয়টি বিশেষায়িত ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

২। ভূ-অভ্যন্তরস্থ দুর্যোগ কোনটি?
(ক) বন্যা (খ) খরা (গ) ভূমিকম্প (ঘ) ভূমিধ্বস

৩। দূষণের ফলে হতে পারে-
i. অতিবৃষ্টি ii. অনাবৃষ্টি iii. পর্যাপ্ত উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

প্রাণি ও উদ্ভিদ জগতের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান বায়ুমণ্ডল। কিন্তু কখনো কখনো বায়ুমণ্ডলে গোলযোগ দেখা দেয়। যা শুধু জীবন ও সম্পদের ক্ষতি করে না পরিবেশেরও ক্ষতি করে।

৪। আলোচ্য ঘটনাটি কোন ধরনের দুর্যোগের অন্তর্ভুক্ত?
(ক) মানবসৃষ্ট (খ) প্রকৃতিসৃষ্ট (গ) মিশ্র প্রকৃতির (ঘ) কোনটিই নয়

৫। উদ্দীপকে উল্লিখিত দুর্যোগের ফলে দেখা দিতে পারে-
i. বায়ু দূষণ ii. পানি দূষণ iii. মৃত্তিকা দূষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ বলতে পারবেন এবং
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র বর্ণনা করতে পারবেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

সাধারণভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার জন্য দুর্যোগ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে যে কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সেগুলোর সমন্বিতরূপকে বুঝায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বলে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নতুবা দুর্যোগে সবকিছু হারিয়ে মানবজীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। দুর্যোগের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব যার বাস্তব উদাহরণ বাংলাদেশ। যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ এবং সফল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে-

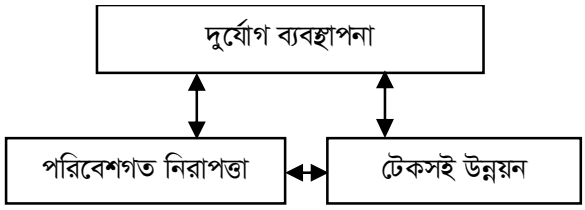

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো–

১. দুর্যোগকালীন সময়ে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো বা পরিমাণ হ্রাস করা;
২. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের জন্য স্বল্প সময়ে প্রয়োজনীয় ত্রাণ, চিকিৎসাসামগ্রী ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং
৩. দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র (Disaster Management Cycle) : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র বলতে দুর্যোগ মোকাবেলার সাথে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পর্যায়গুলোকে বুঝানো হয়ে থাকে (চিত্র ১২.৪.১)। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রকে দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা-

ক. দুর্যোগ পূর্ব ঝুঁকি হ্রাস পর্যায় এবং
খ. দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার পর্যায়।

ক. দুর্যোগ পূর্ব ঝুঁকি হ্রাস পর্যায় (Pre Disaster Risk Reduction Phase) : দুর্যোগ পূর্ব ঝুঁকি হ্রাস পর্যায়ে তিন ধরনের কার্যক্রম চালানো হয়। এগুলো হলো–পূর্ব প্রস্তুতি, প্রতিরোধ এবং প্রশমন।

১. পূর্ব প্রস্তুতি (Preparedness) : প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে দুর্যোগ পূর্ব সময়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, সেগুলোকে পূর্ব প্রস্তুতি বলে। দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ও ঘরবাড়ি চিহ্নিতকরণ, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয় সাধনের রূপরেখা নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট ও যানবাহন প্রস্তুত রাখা, আধুনিক পূর্বাভাস ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রাখা, খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুত রাখা অন্যতম।

২. প্রতিরোধ (Prevention) : প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে রাখার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেমন- বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য বেড়িবাঁধ নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্প থেকে রক্ষার জন্য বিল্ডিং কোড অনুযায়ী ভবন নির্মাণ, নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ সোজা করে নদীভাঙন কমানো ইত্যাদি। এভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ অর্থাৎ অবকাঠামো নির্মাণ করা ব্যয়বহুল হলেও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে অবকাঠামোগত প্রতিরোধের চেয়ে অঅবকাঠামোগত প্রতিরোধ যেমন প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি খুব অল্প খরচে এবং সহজেই করা যায়।

৩. প্রশমন (Mitigation) : দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ সংঘটনের হার হ্রাস করা এবং দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে প্রশমন বলে। দুর্যোগ প্রশমন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মজবুত ও পাঁকা ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, শস্য বহুমুখীকরণ, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোক স্থানান্তর, বনায়ন, বেড়িবাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি।

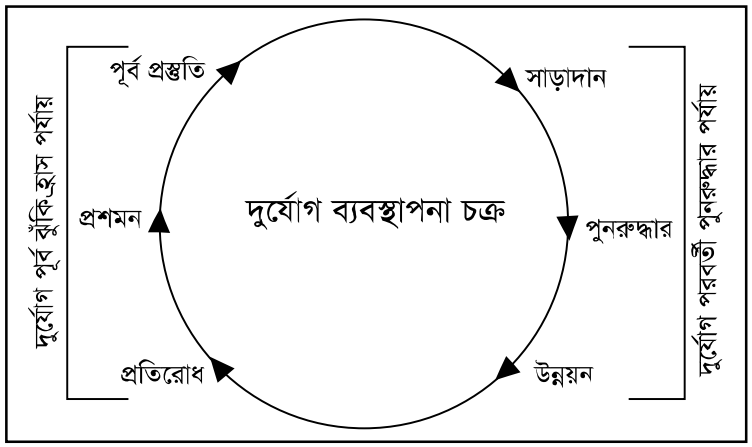

চিত্র ১২.৪.১: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র

খ. দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার পর্যায় (Post Disaster Recovery Phase) : দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার পর্যায়ে তিন ধরনের কার্যক্রম চালানো হয়। এগুলো হলো– সাড়া প্রদান, পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়ন।

১. সাড়া প্রদান (Response) : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রে সাড়াপ্রদান গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পর নিজের এবং অন্যের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করাকে সাড়া প্রদান বলে। সাড়া প্রদান কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে উদ্ধার, চিকিৎসা, খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, আশ্রয়, বস্ত্র, ধ্বংসস্তুপ অপসারণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ, পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রভৃতি। উপযুক্ত সাড়া প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার লোকজন দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারে। এসব কারণে দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়া প্রদান প্রয়োজন হয়।

২. পুনরুদ্ধার (Recovery) : দুর্যোগের ফলে সম্পদ, অবকাঠামো, পরিবেশ ইত্যাদির যে ক্ষতি হয় তা পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনাকে পুনরুদ্ধার বলে। এক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য ও সহায়তা প্রয়োজন হয়। যেমন- ঘরবাড়ি নির্মাণ, রাস্তাঘাট মেরামত ইত্যাদিতে অর্থ ও প্রযুক্তি যোগান।

৩. উন্নয়ন (Development) : দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার অব্যবহিত পর উক্ত এলাকার ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে দুইটি কাজ একসঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। প্রথমত, ধ্বংস স্তুপ ও আবর্জনা অপসারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দ্বিতীয়ত, মানব সেবা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, উন্নয়নের সাথে পরিবেশের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করার সময় পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে। এতে পরিবেশ ও উন্নয়ন উভয়ই টেকসই হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে স্বল্প সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের ছকটি পূরণ করুন।

পর্যায়	কার্যক্রমের ধরণ	পর্যায়	কার্যক্রমের ধরণ
পূর্ব প্রস্তুতি		সাড়া প্রদান	
প্রশমন		পুনরুদ্ধার	
প্রতিরোধ		উন্নয়ন	

সারসংক্ষেপ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে দুর্যোগ পূর্ব এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে যে সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয় সেগুলোর পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়, মূল্যায়ন প্রভৃতির সমন্বিতরূপকে বুঝায়। দুর্যোগের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যে কোনো দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। এজন্য বর্তমানে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রে পূর্ব প্রস্তুতি, প্রতিরোধ, প্রশমন, সাড়া প্রদান, পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য কতটি?

(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের প্রধান পর্যায় কতটি?

(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৩। কোনটি সাড়া প্রদানের অন্তর্ভুক্ত কর্মকাণ্ড?

i. উদ্ধার ii. চিকিৎসা iii. সুপেয় পান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

৪। উল্লিখিত ছবিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কোন ধরনের কার্যক্রমটি অন্তর্ভুক্ত?

(ক) সাড়া প্রদান (খ) প্রতিরোধমূলক (গ) পুনরুদ্ধার (ঘ) উন্নয়ন

৫। দুর্যোগ পূর্ব ঝুঁকি হ্রাস পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত–

i. পূর্ব প্রস্তুতি ii. পুনরুদ্ধার iii. প্রতিরোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.৫ দুর্যোগ ও দূষণ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (Steps of Disaster and Pollution Management)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

দুর্যোগ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। প্রায় প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, কালবৈশাখী, নদীভাঙন, খরার মতো কোনো না কোনো দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এসব দুর্যোগ মোকাবেলা করতে গিয়ে সরকার যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা বাংলাদেশকে একটি দক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন দেশে পরিণত করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে পরিচিত। দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেশের আপামর জনগণের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যে কোনো প্রলয়ংকরী দুর্যোগ মোকাবেলায় একটি জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কর্ম পরিচালনা, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি এবং মোকাবেলায় কাজ করে থাকে।

৩. জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে।

৪. স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি : স্থানীয়ভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি রয়েছে। এসব কমিটির মধ্যে রয়েছে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রভৃতি। এসব কমিটি দুর্যোগ পূর্ববর্তী এবং দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ের উপর অনার্স, মাস্টার্স এবং ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। এছাড়া অন্যান্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) : সরকার ২০১০ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন কার্যকর করে এবং এর আগে ২০০৯ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা তৈরি করে। এই ট্রাস্টের আওতায় অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন এবং স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম।

৭. প্রশিক্ষণ : সরকার দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। যেমন-বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, কারারক্ষী, বিএনসিসির সদস্যদের দুর্যোগকালীন দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণ প্রদান। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন এনজিওর সহযোগিতায় জেলায় জেলায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

৮. সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার : দুর্যোগ পূর্ববর্তী সতর্কীকরণের জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগ বার্তা প্রচার, এসএমএস, ইন্টারেকটিভ ভয়েস রেসপন্স, কমিউনিটি রেডিও, উপকূলীয় অঞ্চলে পকেট রেডিও ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৯. মাইক্রোজোনেশন মানচিত্র : আইসিটি নির্ভর মাইক্রোজোনেশন মানচিত্র তৈরি করা। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরের এরূপ মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে যা ভূমিকম্প ঝুঁকিমুক্ত নগরায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া আরো ৬টি ভূমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ শহরের মাইক্রোজোনেশন মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

১০. বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের পাশপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। অক্সফাম, ডিজাস্টার ফোরাম, কেয়ার বাংলাদেশ, প্রশিকা, সিসিডিবি, বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র প্রভৃতি সংস্থা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজ করে থাকে। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজ করে থাকে।

১১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিমালা : সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে নিশ্চিতকরণ এবং দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১। এছাড়া ১৯৯৭ সালের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী সংশোধন করে ২০১০ সালে স্টান্ডিং অডার্স অন ডিজাস্টার্স (এসওডি) সংশোধন করা হয়।

১২. অবকাঠামোগত পদক্ষেপ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যেসব অবকাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো-

১. দুর্যোগকালীন সময়ে সকলের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
২. উপকূলীয় অঞ্চলসহ সারা দেশে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ। যেমন-উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনি প্রকল্প, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি।
৩. বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, স্লুইস গেট, নদী ও খাল খনন।
৪. নদীভাঙন রোধের জন্য নদীর পাড় বাঁধাই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
৫. ভূমিকম্প সহনশীল ঘরবাড়ি, ব্রীজসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ।
৬. বিভিন্ন দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রভৃতি।

দূষণ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ : জনবহুল বাংলাদেশে দূষণ একটি সাধারণ সমস্যা। স্বল্প আয়তনের এদেশে মানুষ জীবিকার তাগিদে বহুবিধ কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। মানুষের এসব কর্মকাণ্ডের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন- বায়ু, পানি, মৃত্তিকা ইত্যাদি দূষিত হয়। এসব দূষণ প্রতিরোধের জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দূষণ প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

যানবাহনজনিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ : পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি কার্যকরী কার্যক্রম যানবাহন হতে সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ। এই কার্যক্রমে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী যানবাহনের ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টির বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এছাড়া যানবাহন সৃষ্ট ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে গাড়ীর পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এছাড়া মোটরযান আইন-১৯৮৩ অনুসারে পুলিশ প্রশাসন জরিমানা আদায় করতে পারে।

ইটভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণ : ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ইটভাটা গড়ে উঠেছে। এসব ইটভাটা যাতে পরিবেশ দূষণ ঘটাতে না পারে সেজন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কেননা ইটভাটায় সৃষ্ট ধোঁয়া বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ। সনাতন পদ্ধতিতে ইটভাটার পরিবর্তে জ্বালানি সাশ্রয়ী, বায়ুদূষণ রোধে কার্যকরি ও আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটা স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বায়ু দূষণ মনিটরিং : বায়ু দূষণ মাত্রা পরিমাপের জন্য ঢাকায় ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি এবং রাজশাহী, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, বরিশাল শহরে ১টি করে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন চালু করা হয়েছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ : শিল্প-কারখানাসমূহের দ্বারা সৃষ্ট দূষণ সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রাখার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। যে কোনো শিল্প-কারখানা স্থাপনের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র নিতে হয়। এক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ অনুসরণ করা হয়। পানি দূষণ প্রতিরোধে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরিবেশ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে।

পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ : সরকার পরিবেশ দূষণ রোধে ২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে ঢাকা শহরে এবং একই সালের মার্চ থেকে সারাদেশে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। পরিবেশ অধিদপ্তর নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগ যাতে ব্যবহার হতে না পারে সে লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা করে থাকে। পাশাপাশি সরকার জনগণকেও সচেতন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

পানির গুণগত মান পরীক্ষা : দেশের বিভিন্ন স্থানের নদী, পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগত মান নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৩ সাল থেকে নদীর পানির মান মনিটরিং করা হয়। বর্তমানে ২৭টি নদীর ৬৩টি স্থানে পানি মনিটরিং করা হচ্ছে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ ছাড়াও সরকার পরিবেশ দূষণ রোধে সমীক্ষা পরিচালনা, দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি, বিষাক্ত ও বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা, পাহাড় কর্তন বন্ধ, বিভিন্ন নীতিমালা ও উদ্যোগ গ্রহণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	দুর্যোগ ও দূষণ মোকাবেলায় আপনার মতামত লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতির ফলে বাংলাদেশ বহুমুখী দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এসব দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে। দুর্যোগ পূর্ববর্তী এবং দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে। সরকার দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণ, পূর্বাভাস প্রদান ও সতর্কীকরণ, প্রশিক্ষণ, আইন ও নীতিমালা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো যানবাহন সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বায়ু দূষণ মনিটরিং, শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ, পানির মান মনিটরিং প্রভৃতি। তাই বলা যায় যে, সরকার দুর্যোগ ও দূষণ মোকাবেলায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করছে। আমাদেরও দুর্যোগ ও দূষণ মোকাবেলায় সচেতন হতে হবে এবং অন্যকে সচেতন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন কত সালে প্রণীত হয়?
(ক) ২০১০ (খ) ২০১১ (গ) ২০১২ (ঘ) ২০১৩

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অংশ হলো–
i. আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ii. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ iii. সতর্কীকরণ পূর্বাভাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। দেশে কতটি বায়ু দূষণ মনিটরিং কেন্দ্র রয়েছে?
(ক) ১০টি (খ) ১১টি (গ) ১২টি (ঘ) ১৩টি

৪। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন কত সালে প্রণীত হয়?
(ক) ১৯৯৪ (খ) ১৯৯৫ (গ) ১৯৯৬ (ঘ) ১৯৯৭

৫। পানির মান মনিটরিং কার্যক্রম শুরু হয় কত সালে?
(ক) ১৯৭৩ (খ) ১৯৮৩ (গ) ১৯৯৩ (ঘ) ২০০৩

৬। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন কত সালে প্রণীত হয়?
(ক) ২০০৯ (খ) ২০১০ (গ) ২০১২ (ঘ) ২০১৩

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

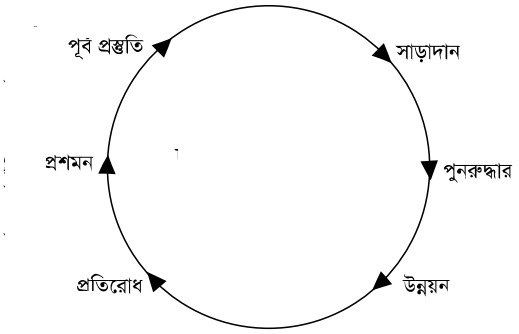

ক. দুর্যোগ প্রধানত কত প্রকার?
খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?
গ. 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ রোল মডেল'-উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করুন।
ঘ. চিত্রে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন -২

২০০৯ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলা আঘাত হানে। উক্ত ঝড়ে মারা যায় মানুষসহ অন্যান্য প্রাণি। ধ্বংস হয় ঘরবাড়ি, সহায় সম্পদ, ম্যানগ্রোভ ফরেস্টসহ অন্যান্য উদ্ভিদ। তবে সরকারের গৃহীত বহুমুখী পদক্ষেপ ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। একইসাথে দুর্যোগ আক্রান্ত সাধারণ মানুষের দৃঢ় মনোবল ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করেছে।

ক. ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য কমপক্ষে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন?
খ. বাংলাদেশ কোন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়?
গ. ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. আলোচ্য দুর্যোগটি আক্রান্ত এলাকায় কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে? বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.১ : ১. গ ২. ঘ ৩. ঘ ৪. গ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.২ : ১. ঘ ২. খ ৩. গ ৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৩ : ১. ক ২. গ ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৪ : ১. ক ২. ক ৩. ঘ ৪. খ ৫.গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৫ : ১. গ ২. ঘ ৩. খ ৪. খ ৫. ক ৬. ঘ